বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু : কারণ ও প্রতিকার

এ এম ইমদাদুল ইসলাম

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, নদীবাহিত ভূ-প্রকৃতি এবং ঘনবসতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এখানে দ্রুত দৃশ্যমান হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, বন্যা, খরা ও লবণাক্ততার বিস্তারের ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ তাদের বসতভিটা হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। এদেরই বলা হয় জলবায়ু উদ্বাস্তু বা Climate Refugee। এসব জলবায়ু উদ্বাস্তুরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেদের স্থায়ী আবাস ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাইরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু হওয়ার প্রধান কারণ হলো নদীভাঙন। নদীভাঙন আমাদের দেশে একটি সাধারণ ও গুরুতর প্রাকৃতিক সমস্যা। বর্ষাকালে নদীতে পানির পরিমাণ ও স্রোতের গতি অনেক বেড়ে যায়। তীব্র স্রোত নদী তীরের মাটি ক্ষয় করে, ফলে নদীভাঙন ঘটে। আমাদের দেশের নদীগুলো প্রচুর পলি বহন করে। কোথাও পলি জমে নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে গেলে নদী নতুন পথ খুঁজে নেয়, যার ফলে তীর ভাঙতে শুরু করে। দেশের অধিকাংশ নদীতীর পলিমাটি দিয়ে গঠিত, যা সহজেই পানির স্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নদীর বাঁকের বাইরের অংশে স্রোতের চাপ বেশি থাকে। ফলে ওই অংশে ভাঙন বেশি হয়, আর ভেতরের অংশে পলি জমে। অতিবৃষ্টি, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা এবং উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহ নদীভাঙনের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও মানবসৃষ্ট কারণতো আছেই। নদী থেকে অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন, নদীতীরে গাছপালা কেটে ফেলা অপরিকল্পিত বাঁধ বা স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি কারণে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়ে ভাঙন ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশে প্রবাহিত অনেক নদীর উৎস দেশের বাইরে। উজান থেকে হঠাৎ অতিরিক্ত পানি নেমে এলে নদীর স্রোত বেড়ে ভাঙন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পদ্মা নদী, যমুনা নদী এবং মেঘনা নদী নদীগুলোর তীরবর্তী এলাকায় নদীভাঙন বেশি দেখা যায়।

বাংলাদেশে বন্যার কারণে অনেক মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যার তীব্রতা ও ঘনঘনতা বাড়ছে, যার প্রভাব মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর সরাসরি পড়ছে। দীর্ঘস্থায়ী বন্যা ও নদীভাঙনে ঘরবাড়ি, জমি ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক পরিবার স্থায়ীভাবে তাদের বসবাসের স্থান হারায় এবং জীবিকাও নষ্ট হয়ে যায়। কৃষিজমি পানিতে তলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাছ চাষ, গবাদিপশু পালন ও ছোট ব্যবসা ক্ষতির মুখে পড়ে। আয়ের উৎস হারিয়ে মানুষ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হয়। নিরাপদ পানির অভাব দেখা দেয়। খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। ডায়রিয়া, কলেরা, চর্মরোগসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হয়, ফলে অনেক পরিবার নিরাপদ স্থানে আশ্রয় খুঁজে নেয়। গ্রামাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ কাজ ও আশ্রয়ের সন্ধানে শহরে চলে আসে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য বড়ো শহরে জলবায়ু উদ্বাস্তু অভিবাসীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে।

বাংলাদেশের বহু নদী প্রতিবছর গতিপথ পরিবর্তন করে এবং তীরবর্তী অঞ্চল ভেঙে ফেলে। বিশেষ করে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষ ঘরবাড়ি, জমিজমা ও জীবিকা হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ছে। গবেষণা অনুযায়ী, পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা অববাহিকায় প্রতি বছর ৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে

স্থানচ্যুত হয়। বাংলাদেশে নদীভাঙনের কারণে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার জমি বিলীন হয়ে যায়। ১৯৭৩ সাল থেকে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী মিলিয়ে প্রায় ১,৬০০ বর্গকিলোমিটার প্লাবনভূমি ক্ষয় করেছে। গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী, নদীভাঙনের ফলে প্রায় ১৬ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়েছে। বাংলাদেশের কম-বেশি দুই কোটি মানুষ নদীভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে। দেশের ২৮৩টি স্থান, ৮৫টি শহর ও গ্রোথ সেন্টার নদীভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর ভাঙন শুধু একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট।

বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea Level Rise) জলবায়ু উদ্বাস্তু তৈরির অন্যতম প্রধান কারণ। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকাগুলো খুবই নিচু হওয়ায় সমুদ্রের পানি ধীরে ধীরে স্থলভাগে প্রবেশ করছে, ফলে মানুষ তাদের বাসস্থান ও জীবিকা হারিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে উপকূলের নিচু ভূমি স্থায়ী বা মৌসুমি জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয়। গবেষণা অনুযায়ী, এক মিটার সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ১৭.৫ ভাগ ভূমি প্লাবিত হতে পারে এবং প্রায় দেড় কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি নদী, খাল, পুকুর ও ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করছে। এর ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট তৈরি হচ্ছে। কৃষিজমির উর্বরতা কমছে এবং ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। মিঠা পানির মাছ কমে যাচ্ছে।

উপকূলীয় কৃষিজমির বড়ো একটা অংশ ইতোমধ্যে লবণাক্ততার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও বাড়বে। কৃষিকাজ অলাভজনক হয়ে পড়ছে এবং মাছ ধরার সুযোগও কমছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছাস আরও ভেতরে প্রবেশ করে। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তা, বাঁধ ও কৃষিজমি বেশি পরিমাণে ধ্বংস হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অনেক সময় আর নিজ এলাকায় ইচ্ছা থাকলেও ফিরে যেতে পারে না। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে সুন্দরবন উপকূল অঞ্চল, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ভোলা, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার। এসব অঞ্চলে লবণাক্ততা, জলোচ্ছাস ও ভূমি হারানোর সমস্যা দ্রুত বাড়ছে। এভাবেই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ ক্রমশ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী গবেষণার আলোকে অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি মানুষ জলবায়ুজনিত কারণে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে, যদি পর্যাপ্ত অভিযোজন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়।

দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ জলবায়ু উদ্বাস্তু হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, উঁচু বাঁধ, বন্যা-সহনশীল সড়ক, নদীতীর সংরক্ষণ, উঁচু প্ল্যাটফর্মে ঘরবাড়ি, নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ অবকাঠামো। বাংলাদেশে ২০২৫ সালের একটি জাতীয় মূল্যায়ন অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায় ৪৯.৫ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনই এর প্রধান কারণ। যখন কোনো এলাকায় টেকসই বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র ও সুরক্ষা অবকাঠামো থাকে, তখন মানুষকে স্থায়ীভাবে এলাকা ছেড়ে যেতে হয় না; তারা দুর্যোগের পর দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। বাংলাদেশে নির্মিত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিচালিত Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP) কর্মসূচির আওতায় ৯টি উপকূলীয় জেলায় ৫৫২টি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র, ৪৫০টি পুরোনো আশ্রয়কেন্দ্র

সংস্কার এবং ৫৫০ কিলোমিটার বেশি সরিয়ে নেওয়ার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ পেয়েছে।

এ ছাড়াও নদীশাসন, তীর সংরক্ষণ এবং পরিকল্পিত ড্রেজিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। লবণসহিষ্ণু ফসল চাষ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসন, আবাসন এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কার্বন নিঃসরণ কমানো, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বনভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য উন্নত দেশগুলোর জলবায়ু তহবিল ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটেরও কারণ। বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, যা ভবিষ্যতে আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তাই সরকার, বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন নিশ্চিত করা জরুরি। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় টেকসই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার